পশ্চিমবঙ্গের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিলেবাস অনুসরণে লিখিত
বাংলা অনার্স, পাস ও এম-এ-র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস
ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনাগ্রন্থ

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসরণে
সংযোজিত, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সম্পূর্ণ নতুন
সর্বাধুনিক সংস্করণ, ডিসেম্বর, ২০০৮

ড. বিজিত ঘোষ
এম. এ. (প্রথম শ্রেণিতে প্রথম, ক.বি.),
এম. ফিল (প্রথম শ্রেণি), পিএইচ.ডি. (ক.বি.);
অধ্যাপক, শ্রীরামপুর কলেজ
প্রাক্তন অধ্যাপক : টাকি গভর্নমেন্ট কলেজ, মতিঝিল কমার্স কলেজ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (আংশিক)।

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্য সুপ্রাচীন ও সুবিশাল। সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপ্তি সুদীর্ঘ চার হাজার বছরেরও অধিক সময়কালের। বৈচিত্র্য ও বৈভবে বিশ্বসাহিত্যের দরবারেও সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অনবদ্য অবদান বিস্ময়কর ও তুলনাহীন।

এখন জানা জরুরি, 'সংস্কৃত ভাষা' ও 'সংস্কৃত সাহিত্য' বলতে ঠিক কী বোঝায়? সংস্কৃতকে বলা হয় 'ভারতীয় আর্যভাষা'। বৈদিক যুগের ভাষা থেকে শুরু করে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর ভাষা ও তারও পরবর্তীকালের ভাষাও সংস্কৃত ভাষারই অন্তর্ভুক্ত।

'সংস্কৃত' শব্দটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সংস্কার (refinement)-এর প্রসঙ্গটি। সেই প্রেক্ষিতে অনুমান করা যেতে পারে, প্রাচীনকালের কোনো ভাষা ক্রমশ refined হয়ে 'সংস্কৃত' ভাষার রূপ গ্রহণ করেছে। কারো কারো মতে সেটি আসলে প্রাকৃত ভাষা (জনসাধারণের স্বাভাবিক ভাষা)। আবার কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, মূল ভাষাটিই ছিল সংস্কৃত। তারই বিকৃতি প্রাকৃত ভাষা।

সংস্কৃত ভাষাকে তিনটি পৃথক ক্ষেত্রে বিন্যস্ত করে দেখানো যেতে পারে।

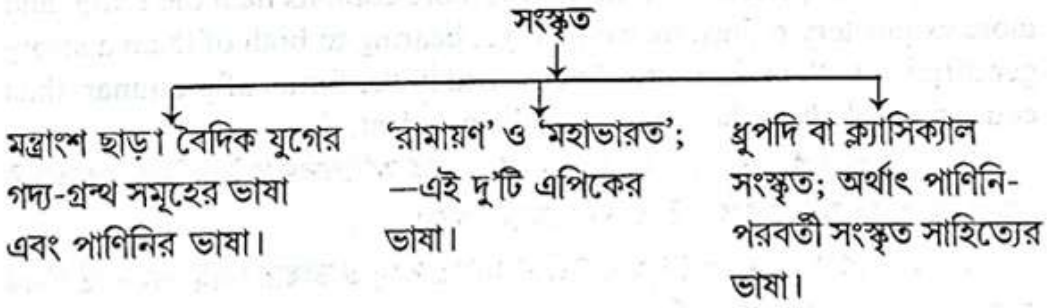

ভারতীয় ভাষা সমূহের মধ্যে সর্বভারতীয় ভাষারূপে সংস্কৃত তার স্থান অধিকার করে নিয়েছিল সেই প্রাচীনকাল থেকেই। ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক, বাহক ও পোষক হিসেবে দেশে ও বিদেশে জ্ঞানীগুণী মহলে সমাদর লাভ করেছিল।

প্রাচীন ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের যাবতীয় চিন্তাভাবনাই ধরা আছে এই সংস্কৃত ভাষাতেই। ভারতবর্ষে সংস্কৃত ভাষার চর্চা ও বিকাশের ইতিহাস চার হাজার বছরেরও অধিক সময় ব্যাপী। কেবলমাত্র ভারতেই নয়, বৃহত্তর ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে (সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি) সংস্কৃত ভাষার অবদান সব থেকে বেশি। এমনকী বহির্ভারতেও, যেমন চিন, জাপান প্রভৃতি দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে সংস্কৃত ভাষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একেবারে প্রাথমিক পর্বে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন কেবলমাত্র বৈদিক ধর্মকর্মের ধারক-বাহক তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির রক্ষক উচ্চবর্ণের পণ্ডিত মানুষেরা। পরবর্তীকালে অবশ্য তাঁদের উত্তরাধিকারিগণ রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাচীন সংস্কৃত চর্চাকে নিরন্তর অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

পাণিনি আর্যভাষার যে সংস্কার সাধন করেছিলেন, কালক্রমে সেটিই সমাদৃত হয় শিষ্ট (standard) ভাষারূপে। সেই পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও পরিশোধিত আর্যভাষাই আজ সংস্কৃত ভাষা নামে সুপ্রচলিত।

শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর 'সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, 'অর্বাচীন বৈদিক মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির ভাষাতে সংস্কৃতের জন্মলগ্ন পরিস্ফুট। প্রাচীন উপনিষদগুলিতে (ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য, শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতি) অর্বাচীন বৈদিক ভাষার লক্ষণ স্পষ্ট এবং সূত্র সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃতের শৈশবাবস্থা লক্ষণীয়। প্রাচীন বিদ্বজ্জন সংস্কৃতকে 'দেবভাষা', 'সুরভারতী', 'গীর্বাণবাণী' নামে প্রশংসা করেছেন।'

আমাদের সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন আধুনিক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতগণও। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ William Jones ১৭৮৬ সালে Asiatic Society-র সভায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাষা-অনুসন্ধানীদের উদ্দেশে বলেছিলেন :

'The Sanskrit Language, whatever be its antiquity, is of a wonderful structure, more perfect than the Greek, more copious than the Latin, and more exquisitery refined than either, yet bearing to both of them a stronger affinity, both in the roots of verbs and in the forms of grammar, than could possibly have been produced be accident...'

সবশেষে সংস্কৃত ভাষা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটি স্মরণ করেই আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গের ইতি টানা যেতে পারে।

'ভারতবর্ষের চিরকালের যে চিত্ত, সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার তীর্থপথ দিয়ে আমরা দেশের চিন্ময় প্রকৃতির স্পর্শ পাব, তাকে অন্তরে গ্রহণ করব...। সংস্কৃত ভাষার একটা আনন্দ আছে, সে রঞ্জিত করে আমাদের মনের আকাশকে, তার মধ্যে আছে একটা গভীর বাণী, বিশ্বপ্রকৃতির মতোই সে আমাদের শান্তি দেয় এবং চিত্তকে মর্যাদা দিয়ে থাকে।'

আকাশ অ্যাপার্টমেন্ট,
শ্রীরামপুর, হুগলি

(ড. বিজিত ঘোষ)

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়	কালিদাস	১৯-১৮৯

১. কালিদাসের আবির্ভাব কাল : ১৯-২০

২. মালবিকাগ্নিমিত্রম্ : ২০-২৫

(ক) কাহিনি, (খ) চরিত্র-চিত্রণ : বিদূষক, ধরিণী, অগ্নিমিত্র, ইরাবতী, মালবিকা, কৌশিকী, (গ) তৎকালীন রাজঅন্তঃপুরের বাস্তবসম্মত চিত্র, (ঘ) নাটকটিতে কবিত্বের প্রথম উন্মেষ, (ঙ) বাংলা সাহিত্যে প্রভাব : রবীন্দ্র-কাব্যে।

৩. বিক্রমোর্বশীয়ম্ : ২৫-৩৩

(ক) কাহিনি, (খ) মূল কাহিনির বিয়োগান্তক পরিণতিকে কালিদাস রূপ দিয়েছেন মিলনে, (গ) এই নাটকের চতুর্থ অঙ্কটি নাট্যকারের এক অভিনব সংযোজন, (ঘ) চরিত্র-চিত্রণ : উর্বশী, চিত্রলেখা, পুরুরবা, (ঙ) এই নাটকটির দুটি পাঠান্তর পাওয়া যায়, (চ) ত্রোটক, গীতিনাট্য, রূপকথা, (ছ) 'উপমা কালিদাসস্য', (জ) বাংলা সাহিত্যে প্রভাব ঃ বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', গোবিন্দদাসের পদাবলি, শ্রীমধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা' কাব্য।

৪. অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ : ৩৩-৮৮

(ক) কাহিনি, (খ) মূল গল্প ও কালিদাসের নাটকে প্রভেদ, (গ) কালিদাসের নাটকে দুষ্মন্তের নায়কোচিত মহিমা অক্ষুণ্ণ থেকেছে দুর্বাসার অভিশাপ, (ঘ) শকুন্তলা-চরিত্র, (ঙ) প্রাচ্য পণ্ডিত ও পাশ্চাত্যের মনীষীদের কাছে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এক মহা মূল্যবান গ্রন্থ, (চ) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অঙ্কটির অনন্যতা, (ছ) কণ্ব-চরিত্র, (জ) করুণ রসের চিত্র নির্মাণে কালিদাসের অসামান্য দক্ষতা : শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, (ঝ) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের অসাধারণ নাট্যগুণ, (ঞ) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শেষ অঙ্কের (সপ্তম) শেষ দৃশ্যটি কালিদাসের হাতে লাভ করেছে স্বর্গীয়-সৌন্দর্য, (ট) বাংলা ভাষায় 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের অনুবাদ : ১. রামতারক ভট্টাচার্য, ২. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ৩. নন্দকুমার রায়, ৪. হরিমোহন গুপ্ত, ৫. রামনারায়ণ তর্করত্ন, ৬. অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭. নন্দলাল রায়, ৮. হরলাল রায়, ৯. ব্রজনাথ চক্রবর্তী, ১০. কুঞ্জবিহারী বসু, ১১. প্রমথনাথ সরকার, ১২. গোবিন্দচন্দ্র রায়, ১৩. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪. হরিপদ চৌধুরী, ১৫. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৬. সীতানাথ বসু ও প্রমথনাথ বিশ্বাস, ১৭. সারদারঞ্জন রায়, ১৮. হরিদাস আচার্য, ১৯. অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২০. কৃষ্ণপদ বিদ্যারত্ন, ২১. কালিদাস রায়, ২২. কুড়রাম ভট্টাচার্য,

২৩. শত্রুজিৎ দাশগুপ্ত, (ঠ) কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের উপাখ্যান-রসকে বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যেও আশ্চর্যরকম দক্ষতায় সার্থক করে তুলেছেন, (ড) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকটির কাব্যানুবাদ করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, (ঢ) 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বাংলা ভাষায় নাট্যানুবাদ করেছেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, (ণ) **বাংলা সাহিত্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রভাব** : ১. বৈষ্ণব-সাহিত্যে : শ্রীরূপ গোস্বামীর 'বিদগ্ধমাধব', 'ললিতমাধব', বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, ও গোবিন্দদাসের পদে; ২. বঙ্কিম-সাহিত্যে, ৩. রবীন্দ্র-সাহিত্যে, ৪. রামেন্দ্রসুন্দরের রচনায়, ৫. মধুসূদন- সাহিত্যে।

- মধুসূদন দত্তের 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রভাব।
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কালিদাস-চর্চা

১. "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে—

২. "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'শকুন্তলা, মিরান্দা ও দেস্‌দিমোনা'—

৩. 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের শকুন্তলা চরিত্রের সঙ্গে শেকসপিয়রের 'দ্য টেম্পেস্ট' নাটকের মিরান্দা এবং 'ওথেলো' নাটকের দেসদিমোনার তুলনামূলক আলোচনা।

- রবীন্দ্র-সাহিত্যে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রভাব

১. 'মালতী' পুঁথি-তে, ২. 'বনফুল' কাব্যের আখ্যাপত্রে, ৩. "য়ূরোপ প্রবাসীর পত্র"- এ, ৪. "চৈতালি" কাব্যগ্রন্থের 'মিলনদৃশ্য' কবিতায়, ৫. "চৈতালি" কাবগ্রন্থের 'হৃদয়ধর্ম' কবিতায়, ৬. "প্রাচীন সাহিত্য" গ্রন্থের 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে, ৭. "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'নববর্ষা' প্রবন্ধে।

- গ্যেটের মূল্যবান অভিমত, রবীন্দ্র-অনুবাদে ও ব্যাখ্যায় : 'কেহ যদি তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, কেহ যদি মর্ত্য ও স্বর্গ একত্রে দেখিতে চায়, তবে শকুন্তলায় তাহা পাইবে।'
- রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় শেকসপিয়রের 'টেম্পেস্ট' ও কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের তুলনা।
- রবীন্দ্র-ব্যাখ্যায় শকুন্তলা ও দুষ্মন্ত চরিত্র এবং প্রধানত দুর্বাসার শাপের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য।
- রবীন্দ্র-ভাবনায় কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুর্বাসার 'অয়মহং ভোঃ' উক্তিটির সুগভীর তাৎপর্য।

৫. ঋতুসংহার : ৮৮-৯১

(ক) ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম জীবনের রচনা, (খ) অনেক পন্ডিত এটিকে কালিদাসের রচনা বলেই মেনে নিতে চান না, (গ) পাশ্চাত্য সমালোচক কিথ অবশ্য দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন 'ঋতুসংহার' কালিদাসেরই রচনা, (ঘ) ঋতুসংহার শুধু মাত্র ষড় ঋতুর বর্ণনাই নয়, (ঙ) এক-একটা ঋতুর আগমনি-বার্তা মানুষের মনোলোকে সৃষ্টি করে অপূর্ব ভাব-বৈচিত্র্য : শরৎ-চিত্র, বসন্ত-চিত্র, হেমন্ত-চিত্র, (চ) 'ঋতুসংহার'-এ প্রতিটি ঋতুবর্ণনাতেই আদিরসের স্পর্শকে অস্বীকার করবার উপায় নেই, (ছ) 'ঋতুসংহার'-এ মানব-হৃদয়ের সঙ্গে, মানবদেহের সঙ্গে প্রকৃতির অন্তর্গূঢ় সম্পর্কই কালিদাসের কবিত্বকে করেছে উদ্ভাসিত, (জ) **বাংলা সাহিত্যে প্রভাব** : বৈষ্ণব পদাবলি, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'উত্তররামচরিত' প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, "চৈতালি" কাব্যগ্রন্থের

'ঋতুসংহার', 'ভ্রষ্টলগ্না' ও 'সেকাল' কবিতায়, "শিক্ষা" গ্রন্থের 'তপোবন' প্রবন্ধ, "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ, "বিবিধ প্রসঙ্গ" গ্রন্থের 'বসন্ত ও বর্ষা' প্রবন্ধ, "বিচিত্র প্রবন্ধ" গ্রন্থের 'কেকাধ্বনি', ও 'নববর্ষা' প্রবন্ধ।

৬. কুমারসম্ভবম্ : ৯১-১৩৬

(ক) 'কুমারসম্ভব' নামের সার্থকতা,

(খ) কাহিনি : প্রথম সর্গে অঙ্কিত হয়েছে হিমালয়ের মনোরম চিত্র, দ্বিতীয় সর্গে তারকাসুরের হাতে নিগৃহীত হয়ে দেবগণ ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হয়েছেন, তৃতীয় সর্গে পার্বতী-শিবের মিলনে জন্ম হয়েছে কুমারের, চতুর্থ সর্গে বর্ণিত হয়েছে কামদেব মদনের স্ত্রী রতির বিলাপ, পঞ্চম সর্গে কঠোর তপস্যায় বসেছেন পার্বতী, ষষ্ঠ সর্গে পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব, সপ্তম সর্গে শিব-পার্বতীর পরিণয় সম্পাদিত হয়েছে, অষ্টম সর্গে হর-পার্বতীর মিলনে জন্ম নিয়েছে কার্তিক।

(গ) চরিত্র-চিত্রণ : শিব, পার্বতী, পর্বত, পর্বত-মহিষী, ঋষি, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রতি।

(ঘ) 'কুমারসম্ভব' কাব্যের একদিকে আছে রক্তমাংসের মানুষের স্বাধীন কামনা; আর একদিকে সর্ব-কামনাজয়ী মানুষের অটল প্রশান্তি।

(ঙ) দেবদেবী চরিত্রের উপরেও মানবীয় স্বভাববৈশিষ্ট্য আরোপ করে সামগ্রিকভাবে শিব-পার্বতীকে মনুষ্য চরিত্র হিসেবে সম্পূর্ণ ও জীবন্ত করে তুলেছেন কালিদাস।

(চ) 'কুমারসম্ভব' কেবলমাত্র কালিদাসের রচনাবলির মধ্যেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, (ছ) হিমালয় বর্ণনায় কালিদাস অনন্যসাধারণ দক্ষতায় পরিচয় দিয়েছেন, (জ) প্রথম সর্গে পার্বতীর রূপ বর্ণনায় কালিদাসের বিস্ময়কর প্রতিভার চূড়ান্ত বিকাশ লক্ষ করা যায়, (ঝ) কুমারসম্ভব কাব্যে সমকালীন গার্হস্থ্য-জীবনের এক অপূর্ব পরিচয় দিয়েছেন কালিদাস, (ঞ) কুমারসম্ভব সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত : 'আমাদিগের বিবেচনায় কুমারসম্ভবের তৃতীয় সর্গের কবিত্বের ন্যায় কবিত্ব কোনো ভাষার কোনো মহাকাব্যে আছে কিনা সন্দেহ।' (ট) 'কুমারসম্ভব'-এর তৃতীয় সর্গের অকাল-বসন্তের চিত্র-নির্মাণে কালিদাসের অসামান্য দক্ষতা, (ঠ) এখানে কালিদাস দুটি শক্তির চমৎকার সঞ্চার দেখিয়েছেন; বনলোকে বসন্তের, আর মনোলোকে কন্দর্পের, (ড) কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গটি বুঝিয়ে দেয়, কালিদাস ঠিক কোন্ অর্থে আদিরসের কবি; আদিরসের এ এক মধুরতম, মদিরতম আলেখ্য, (ঢ) তৃতীয় সর্গের অপরূপা পার্বতী, (ণ) 'কুমারসম্ভব' কাব্যটিতে কালিদাসের কাব্য-প্রতিভা ও নাট্য-দক্ষতার চমৎকার সহাবস্থান ঘটেছে, (ত) দৃশ্যকাব্য হিসেবে কুমারসম্ভব, (থ) কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে প্রথম থেকে শেষাবধি নাটকীয়তা লক্ষণীয়, (দ) কালিদাসের কাব্য-প্রতিভা গুণে মদনের আকস্মিক মৃত্যু সহৃদয় পাঠকের অন্তরকে কারুণ্যে আপ্লুত করে, (ধ) পাঠক-অন্তরকে স্পর্শ করে, পার্বতীর রূপ-যৌবন ব্যাপারে পরাভব জনিত সকরুণ সংকোচ ও বেদনা, (ন) কুমারসম্ভব কাব্যের শিব ত্যাগ, মুক্তি ও মঙ্গলের প্রতীক। আর উমা পার্থিব জীবন-ভোগের প্রতীক। একদিকে ইন্দ্রিয়াসক্তি, আর একদিকে সংযম; স্বার্থপরতা ও স্বার্থত্যাগ, ভোগ ও ভোগ-বিরতি,—এই দুই নিয়েই জীবন, (প) কুমারসম্ভব কাব্যে প্রেমের স্বরূপ ও মহিমা উজ্জ্বলতর রূপে তুলে ধরাই ছিল কালিদাসের মুখ্য অভিপ্রায়।

প্রথম অধ্যায়

কালিদাস

১. কালিদাসের আবির্ভাবকাল

কালিদাসকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বিচিত্র সব কাহিনি। প্রচলিত আছে নানা কিংবদন্তিও। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে সঠিক তথ্য খুবই কম পাওয়া গেছে। এমনকি তাঁর আবির্ভাবকালটিও নিঃসংশয় ভাবে সঠিক বলা যায় না। তবে তাঁর সময়কালের ঊর্ধ্বতম ও নিম্নতম একটা সীমা নির্দেশ করা যেতে পারে।

কালিদাস রাজা অগ্নিমিত্র সুঙ্গের (আনুমানিক ১৫০ খ্রিস্ট পূর্ব) পূর্বে জীবিত ছিলেন। 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের ভরতবাক্য থেকে কারো কারো অনুমান কালিদাস রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক (অর্থাৎ প্রথম শতাব্দী)। এটিই কালিদাসের সময়কালের ঊর্ধ্বতম সীমা। আর নিম্নতম সীমা হিসেবে আমরা ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দের উল্লেখ করতে পারি। কেন-না, এই সময়কার বিখ্যাত আইহোল শিলালেখে (দ্বিতীয় পুলকেশীর Aihole inscription-এ) আমরা কালিদাসের উল্লেখ পাই।

'যেনাযোজিনবেশ্ম স্থিরমর্থবিধৌ বিবেকিনা জিনবেশ্ম।
বিজয় তাং রবিকীর্তিঃ কবিতাশ্রিতকালিদাসসভারবিকীর্তিঃ'॥

অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত, কালিদাস গুপ্তযুগের কবি। তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৪৫-৪১৪) রাজত্বকালে জীবিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তেরই উপাধি ছিল বিক্রমাদিত্য। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন কালিদাস।

'জ্যোতির্বিদাভরণ' নামক জ্যোতিষগ্রন্থের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে :

"ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কুর্বেতালভট্টঘটপরঃকালিদাসাঃ
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্ণব বিক্রমস্য॥"

কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য ও সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের মধ্যেই কালিদাসের আবির্ভাব।

আবার কেউ কেউ মনে করেন, রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে রঘুর হূনবিজয় আসলে স্কন্দগুপ্তের হাতে হূনগণের পরাভবেরই প্রতিচ্ছবি। আর এই স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল হল ৪৫৫-৪৮০ খ্রিস্টাব্দ। আবার কেউ মনে করেন কালিদাস আবির্ভূত হয়েছিলেন ষষ্ঠ শতকে।

মোটামুটিভাবে সিদ্ধান্ত করা যায় যে কালিদাস ভাস ও অশ্বঘোষের পরবর্তীকালের।

কারণ কালিদাসের প্রাকৃত ভাষা এঁদের তুলনায় আধুনিক। এছাড়া কবি 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটকের প্রস্তাবনায় নাট্যকারদের নামোল্লেখ করতে গিয়ে ভাসের নাম করেছেন।

তবু ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকারের জীবন-ইতিবৃত্ত হারিয়েই গেছে নানা বিরোধী মতের বিতর্কে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যথার্থই লিখেছেন :

"হায় রে কবে কেটে গেছে
কালিদাসের কাল!
পণ্ডিতেরা বিবাদ করে
লয়ে তারিখ-সাল॥"

সমগ্র ভারতবর্ষের নাট্যকারদের মধ্যে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্ব আজ সর্বজনস্বীকৃত। তিনি তিনটি নাটক লিখেছেন ঃ (১) **'মালবিকাগ্নিমিত্রম্'**, (২) **'বিক্রমোর্বশীয়ম্'** ও (৩) **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্'**। নাটক তিনটিই প্রণয়মূলক—রোমান্টিক।

২. মালবিকাগ্নিমিত্রম্

ক) কাহিনি : এটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। বিদর্ভরাজ-দুহিতা মালবিকা ও বিদিশার শুঙ্গাবংশীয় রাজা অগ্নিমিত্রের প্রণয়কাহিনিই এই নাটকের মূল উপজীব্য। বসন্ত উৎসব উপলক্ষেই নাটকটি রচিত ও প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল।

বিদর্ভরাজ মাধব সেন যজ্ঞসেনের সঙ্গে যুদ্ধে পরাভূত হন। ফলে রাজ্যচ্যুত মাধব সেন ভগিনী মালবিকাকে বিদিশাধিপতি অগ্নিমিত্রের হাতে সমর্পণের জন্য পাঠান। কিন্তু পথেই তাঁরা দস্যুদের হাতে আক্রান্ত হন। দস্যুহস্ত থেকে মালবিকাকে উদ্ধার করেন অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীর সেন। তারপর তাকে তুলে দেন বিদিশামহিষী ধরিণীর হাতে। ধরিণী মালবিকাকে পরিচারিকারূপে রাজ-অন্তঃপুরে রাখেন। মালবিকার অসাধারণ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে রাজা তাকে বিবাহ করতে পারেন, এই আশঙ্কায় সর্বদা ভীত থাকেন রানি।

এদিকে মালবিকার চিত্র দেখেই মুগ্ধ হয়ে যান রাজা অগ্নিমিত্র। আর সে কারণেই জ্যেষ্ঠা মহিষী ধরিণী সর্বক্ষণ মালবিকাকে রাজার দৃষ্টিপথ থেকে দূরে দূরে রাখতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মালবিকার নাট্যকুশলতা পরীক্ষা (নাট্যাচার্য গণদাস ও হরদত্তের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তা মীমাংসার জন্য)-স্থলে রাজা তাকে দেখে ফেলেন। অসামান্যা সুন্দরী মালবিকাকে দেখে রাজা মোহিত হন। বিপদ বুঝে মহারানি ধরিণী মালবিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মহিষী ইরাবতীও মালবিকার প্রতি অত্যন্ত রুষ্টা হন।

অবশ্য শেষ পর্যন্ত রাজার বাল্যসখা বিদূষকের প্রচেষ্টায় সিদ্ধ হয় রাজার উদ্দেশ্য। পরিশেষে রাজা অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মালবিকার প্রণয় ঘটে। ইতিমধ্যে যুদ্ধে যজ্ঞ সেন পরাজিত হন রাজা অগ্নিমিত্রের সেনাপতি বীরসেনের কাছে। তখন মাধব সেন মুক্তি পান। মালবিকা বিদর্ভ দেশের অন্যতম নৃপতি মাধব সেনের ভগিনী, এ-কথা জানতে পেরে

(নাটকের পঞ্চমাঙ্কে মালবিকার পরিচয় পরিব্রাজিকার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে) মহারানি ধরিণী রাজার সঙ্গে মালবিকার বিবাহ দেন।

খ) চরিত্র-চিত্রণ : এই নাটকের চরিত্র-চিত্রণে কালিদাস সবিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন। বিদূষকের চরিত্রটি এখানে চমৎকার জীবন্তরূপ পেয়েছে। এই বিদূষক চরিত্রটি নাটকটিতে একটি স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করেছে। বিদূষক এখানে যতখানি স্থান ও গুরুত্ব পেয়েছে, কালিদাসের আর কোনো নাটকে তাকে এত উজ্জ্বল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আমরা পাইনে। নাটকের পরিণতি সম্পাদনে বিদূষক এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ।

রাজার প্রথমা স্ত্রী ধরিণীর মনের প্রতিক্রিয়া, টানাপোড়েন এখানে সূক্ষ্ম মাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মহারানি ব্যক্তিত্বসম্পন্না, দৃঢ়চেতা। তিনি আপন পদমর্যাদা বিস্মৃত হন না কখনই। মহারানি ধরিণী উদার। সহিষ্ণু। ধীর। স্থির। শান্ত। ধরিণী অনেকখানিই অন্তর্মুখী চরিত্র। তিনি স্বামীর কার্যকলাপ আগাগোড়াই লক্ষ করেছেন। সে-সব পছন্দ করেছেন কি করেননি তাও বুঝতে পারা যায় না।

একটি শ্লোকে রাজ্ঞী ধরিণী সম্পর্কে সন্ন্যাসিনী, পরিব্রাজিকা কৌশিকী রাজা অগ্নিমিত্রকে চমৎকার বলেছেন :

'মহাসারপ্রসবয়োঃ সদৃশ ক্ষময়োর্দ্বয়োঃ
ধরিণীভূতধারিণ্যোর্ভব ভর্ত্তা শরচ্ছতম্॥' (১/৯১)

—ভূতধাত্রী বসুন্ধরা যেমন বহুমূল্য রত্নপ্রসবা, সে যেমন বীরপুত্র প্রসবিনী এবং ধরিত্রীর মতো সহনশীলা তোমার এই রানি 'ধরিণী', তুমি শত বৎসর কাল এই উভয়ের ভর্তা হয়ে জীবিত থাকো। ধরিত্রীর মতন রত্ন-গর্ভা এবং ধরিণীর মতো সহনশীলা রানিমূর্তিখানি যেন একটা অনির্বচনীয় মহিমায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

পঞ্চম অঙ্কে আমরা বিদূষকের মুখে শুনি ধরিণী পণ্ডিত কৌশিকীকে নির্দেশ দিয়েছেন, মালবিকাকে বিবাহের সাজে সাজিয়ে দেবার জন্য। রক্তাশোকটি ফুলে ফুলে ভরে উঠলে ধরিণী রাজাকে অনুরোধ করেছেন মালবিকাকে সঙ্গে নিয়ে তার শোভা দর্শন করার জন্য। রাজাই বরং মালবিকার জন্য সঙ্কোচ বোধ করেছে। কিন্তু ধরিণী মালবিকার উপস্থিতি মেনে নিয়েছেন। বিবাহ-সাজে সজ্জিতা মালবিকাকে ধরিণী রাজার কাছে নিজেই নিয়ে এসেছেন। রাজার "সংকেতগৃহ" বলে বর্ণনা করেছেন অশোকবৃক্ষটিকে :

"অজ্জউত্ত! এস দে ম্হেহিং তরুণীজনসহাঅস্স
অসোআ সংকেদগেহকো সংকপ্পিদো"

(আর্য্য পুত্র! এষঃতে অস্মাভিঃ তরুণীজনসহায়স্য অশোকঃ সঙ্কেতগৃহং সংকল্পিতম্।) (৫/৪১)।

অথচ রাজা তখনও ধরিণীকে তাদের (তার ও মালবিকার) মিলনপথের অন্তরায় হিসেবেই দেখে চলেছেন। এতে তাঁর অন্তরের দৈন্যই ফুটে উঠেছে :

"অহং রথাঙ্গানামেব প্রিয়া সহচরীব মে।
অননুজ্ঞাতসম্পর্কা ধারিণী রজনীব নৌ।" (৫/৪৭)

মালবিকাকে রাজকন্যা জানতে পেরে ধরিণী বলেছেন :

'কহং রাঅদরিআ ইঅম্? চন্দণং ক্খু মএ
পাদুব্ভবওএন দূসিদং" (৫/৬৭)।

—এ কি! এ রাজকুমারী? চন্দনখণ্ডকে আমি পাদুকা হিসেবে ব্যবহার করে দূষিত করেছি।

রাজা **অগ্নিমিত্র** মালবিকার প্রতি আকৃষ্ট। প্রথমে এ-কথা ইরাবতী জানতে পারেনি। সে রাজার প্রতি অনুরক্ত। তৃতীয় অঙ্কে **ইরাবতী** নিপুণিকাকে বলেছে, শুনেছি মদ্য নাকি স্ত্রীলোকের অলঙ্কারবিশেষ—এই জনপ্রবাদটা কি সত্য?

'হজ্জে ণিউণিএ, সুণামি বহুসো মদো কিল
ইত্থি আঅণস্স বিসেসমণ্ডণং ত্তি। অবি সচ্চো
অঅং লোঅবাদো?' (৩/৬৭)

নিপুণিকার সরস উত্তর,—প্রথমে এটা জনপ্রবাদই ছিল। সম্প্রতি এটা সত্যে পরিণত হয়েছে। বলাবাহুল্য অগ্নিমিত্রের প্রতি ইরাবতীর মত্ততা দর্শন করেই এই মন্তব্য। ইরাবতী অগ্নিমিত্রের কাছে পৌঁছোবার জন্য ব্যগ্র। ঠিক এ-সময়ে মালবিকার আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে নাটকীয় প্রতিঘাত লক্ষণীয়।

অশোক গাছের নীচে মালবিকাকে দেখেই **ইরাবতী** শঙ্কিতা। আর সেখান থেকেই সন্দেহের শুরু। সহসা ইরাবতী গিয়ে পড়লেন **মালবিকা** ও **অগ্নিমিত্রের** মধ্যে। ব্যঙ্গ করলেন, অশোক বৃক্ষের দোহদকার্যে নিযুক্তা মালবিকাকে :

'পুরেহি পুরেহি, অসোত্তকুসুসমংণ দংসেদি,
অঅং উণ পুপ্ফদি এব্ব।'

—পূর্ণ করো, পূর্ণ করো। অশোকে ফুল ফুটুক বা না-ই ফুটুক, ইনি (মালবিকা) তো সদ্যই ফুটে উঠবেন।

গ) তৎকালীন রাজঅন্তঃপুরের বাস্তবসম্মত চিত্র উদ্‌ঘাটনে এই নাটকে কালিদাস বিশেষ মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তখনকার রাজপুরী ছিল ভোগপুরী। প্রেমগত ঈর্ষা ও কলহ সেখানকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এই ঈর্ষা-কলহে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে নাটকটির অন্যতম প্রতিনায়িকা ইরাবতী। তার অসহিষ্ণুতা, রাজার প্রতি তিরস্কার আসলে এক উপেক্ষিতা নারীর পুঞ্জিত বেদনা।

নায়ক-নায়িকা হিসেবে **অগ্নিমিত্র** ও **মালবিকা** চরিত্র দুটিও সুঅঙ্কিত। এ নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র ঐতিহাসিক চরিত্র। এই অগ্নিমিত্রই শুঙ্গ বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আর নায়িকা, বিদর্ভ রাজ্যের অন্যতম সামন্ত মাধবসেনের ভগ্নী মালবিকা। কাহিনির এইটুকুই ইতিহাসাশ্রিত।

মালবিকা শান্ত। তাঁর হৃদয় স্নেহে ভরপুর। তার সখী **কৌশিকীর** উদারতাও প্রশংসনীয়। বহু বিদ্যার অধিকারিণী তিনি। রোগ-শোক-দুঃখে যেন এক মূর্তিমতী শান্তি স্বরূপা। অনেক দুঃখে তাঁকে সংসার পরিত্যাগ করে পথের ভিখারিনি হতে হয়েছে। এছাড়া

নৃত্যশিক্ষক চরিত্রগুলি ও অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্রগুলিও কালিদাসের হাতে অসাধারণ নির্মাণ হয়ে উঠেছে।

মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের প্রথম মিলনের চিত্রটি কালিদাস অসামান্য দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন :

'পথি নয়নয়োঃ স্থিত্বা স্থিত্বা তিরোভবতি ক্ষণাৎ
সরতি সহসা বাহ্বোমধ্যং গতাপি সখী তব।
মনসিজরুজাক্লিষ্টসৈব্যং সমাগম-মায়য়া
কথমপি সখে! বিশ্রব্ধংস্যাদিমাং প্রতি মে মনঃ॥' (৪/১২৮)

—চোখের সামনে সামান্য সময় থেকেই আড়ালে যেতে চেষ্টা করে, প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া মাত্র সরে যেতে চায়। মদনদাহে আসঙ্গলিপ্সায় আমি নিতান্ত কাতর অথচ তার ভাব অন্য, কেমন করে মন তাকে বিশ্বাস করে?

শরীরী-বর্ণনাও কালিদাসের হাতে অনন্ত মাধুর্য পায় ঃ

'হস্তং কম্পয়তে রুণদ্ধি রশনাব্যাপারলোলাঙ্গুলীঃ
স্বৌ হস্তৌ নয়তি স্তনাবরণতামালিঙ্গ্যমানা বলাৎ।
পাতং পক্ষনলনেত্রমুন্নময়তঃ সাচীকরো ত্যাননং
ব্যাজেনাপ্যর্ভিলাষপূরণসুখং নিধ্বর্ত্তয়ত্যেব মে॥' (৪/১৪৬)

—তার নিতম্বনিহিত রসনা স্পর্শের ইচ্ছেয় আমার আঙুলগুলি চঞ্চল হয়ে ওঠে, তখন হাত নেড়ে আমার হাতটি ধরে চেপে। জোর করে আলিঙ্গনের সময় হাত দুখানি দিয়ে সে তার স্তনদ্বয় ঢেকে রাখে। অধরসুধা পান করতে গেলে মুখ সরিয়ে নেয়। তার এই প্রতিকূল ব্যবহারের মাধ্যমেই সে যেন তার অনুকূল ইচ্ছে পূরণ করছে।

ঘ) **নাটকটিতে কালিদাসের কবিত্বের প্রথম উন্মেষ** ও প্রথম যৌবনের প্রেমের উন্মত্ততা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মালবিকার প্রতি রাজার প্রেমোচ্ছ্বাসের সুন্দর প্রকাশ দেখি একটি শ্লোকে :

'ক্ব রুজ্জ হৃদয়প্রমাথিনী ক্ব চ তে বিশ্বাসনীয়মায়ুধম্?
মৃদু তীক্ষ্ণতরং যদুচ্যতে তদিদং মন্মথ! দৃশ্যতে ত্বষি॥' (৩/১৬)

—কোথায় বিশ্বাসযোগ্য কোমল অস্ত্র (কামদেব নিক্ষিপ্ত শর), আর কোথায় এই হৃদয়মন্থন করা সন্তাপ! হে মন্মথ! তোমার নিক্ষিপ্ত অস্ত্রই এমন মৃদু অথচ তীক্ষ্ণ দেখা যায়।

নাট্যকাহিনিটি নাট্যকারের নিজস্ব কল্পনা বলেই বোধ হয়। তবে উপস্থাপনায় ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার একটা চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এখানে উল্লিখিত হয়েছে শুঙ্গাবংশীয় রাজা পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও বসুমিত্রের (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) কথা। ফলে নাটকটিতে আমরা তৎকালীন যুগের সামাজিক অবস্থার একটি অপূর্ব সুন্দর ছবি পাই।

তৎকালীন রাজান্তঃপুরের একটি নিখুঁত ব্যঙ্গচিত্র, রীতিনীতি ও বিলাসবৈভবের ছবিও